বাংলাদেশে উপভাষাচর্চা : গতি ও প্রকৃতি

মো. মনজুর রহমান

উপভাষা : সাধারণ পরিচয় ও ভাষিক সম্পৃক্তি

মানব মনীষার উৎকৃষ্ট নিদর্শনের আকর তার ভাষা। এই ভাষাই তার পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদেই ভাষাকে নিজের মতো করে গড়ে নিতে চায়। ভাষার মধ্যেই একটা সমগ্রতার ছবি ফুটে ওঠে, একটা মান্যতার ছবি ফুটে ওঠে। মানুষের বাগ্‌যন্ত্র দ্বারা উচ্চারিত অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ যে রূপের সাহায্যে একটি বিশেষ সমাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে তাকেই সাধারণভাবে ভাষা বলা হয়ে থাকে।[১] ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমষ্টির কোনো সুনির্দিষ্ট সর্বসাধারণ রূপ নেই। তাই বিভিন্ন ভাষায় যে ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহৃত হয় তা কমবেশি বিভিন্ন। ভাষার কাজে অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়কালে যে জনসমষ্টি বিশেষ একটি নির্দিষ্ট ধ্বনিসমষ্টিকে ব্যবহার করেন, ভাষাবিজ্ঞানীরা তাকে একটি ভাষাসম্প্রদায়রূপে চিহ্নিত করেন। সুতরাং বাঙালিরা একটি ভাষাসম্প্রদায়, কারণ নির্দিষ্ট ধ্বনিসমষ্টিকে নির্দিষ্টক্রমে বিন্যস্ত করে তারা যে ভাব প্রকাশ করে, তা কেবলমাত্র কোনো বাঙালিরই বোধগম্য হয়। তবে কোনো ভাষাসম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই যে সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে সেই ভাষা বলে অর্থাৎ নির্দিষ্ট ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণ করে, তা নয়। অনেক সময় দেখা যায় একই ভাষাসম্প্রদায়ের অন্তর্গত বৃহৎ সমাজে ব্যবহৃত ভাষায় অল্পবিস্তর বৈষম্য, কিন্তু একই ভাষাসম্প্রদায়ের মানুষ দূরবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা হলেও ভাষাটিকে বুঝতে সর্বদাই সক্ষম হয়। তবে ভাষাসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা খুব বেশি হলে উপভাষার উদ্ভব ও বিকাশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে একই ভাষা প্রচলিত, তবু বিশাল এই ভূ-খণ্ডে বিপুলসংখ্যক বাঙালি কখনোই একই উচ্চারণ ও ভাষারীতি ব্যবহার করেন না। সুতরাং কোনো ভাষাসম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোট ছোট অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ভাষা ছাঁদকে উপভাষা বলে।[২]

উপভাষা অপেক্ষাকৃত ছোট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, তাই এগুলোকে ভাষা বলা যায় না।[৩] তবে উপভাষা সৃষ্টি হয় ভাষারই পরিবর্তনে ও বিবর্তনে। উপভাষার লিখিত কোনো রূপ

নেই, মূলত মুখে মুখেই উপভাষা প্রচলিত। এটি স্বতঃস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম। কেবল বলা ও শোনার মধ্যে এই ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উপভাষার নিজস্ব কোনো ব্যাকরণ ও ব্যাকরণগত সুনির্দিষ্ট নিয়মশৃঙ্খলা নেই। উপভাষার স্বরূপ নির্দিষ্ট নয় বলে উপভাষা দ্রুত পরিবর্তনশীল। উপভাষা নির্বাচন হয় আঞ্চলিক শব্দের উচ্চারণগত দিক ও প্রমিত ভাষার মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিতে। কতকগুলো বিশেষ বিশেষ রূপমূল্যের প্রচলন থেকেই কোনো অঞ্চলের উপভাষা চিহ্নিত করা হয়।[৪]

ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতির ব্যবধানের জন্য অঞ্চল বিশেষে অনেক উপভাষার সৃষ্টি হতে পারে। এসব উপভাষার মধ্যে ধ্বনিগত ও উচ্চারণগত প্রভেদ থাকে।[৫] তবে মনে রাখা দরকার যারা গ্রামে বাস করে এবং অশিক্ষিত, তারা যদি শিক্ষা গ্রহণের জন্য বা অন্য কোনো কারণে পরবর্তী সময়ে শহরে যায়, তাদের ভাষায় সেক্ষেত্রে উপভাষার প্রভাব খুবই কম দেখা যায়।[৬] আবার কোনো দেশের বা অঞ্চলের ভাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তারা নানা কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। যাতায়াতসহ বিবিধ কারণে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে এবং তখনই উপভাষা সৃষ্টির সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ভাষাভাষীর সংখ্যাবৃদ্ধি, ভৌগোলিক আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবধান এবং সামাজিক শ্রেণিগত পার্থক্যের কারণে উপভাষা সৃষ্টি হয়।

উপভাষা হল একই ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ আঞ্চলিক রূপ, যার সঙ্গে আদর্শ বা মান্য বা সাহিত্যিক ভাষার ধ্বনিগত-রূপগত-বাক্যনির্মিতিগত এবং বাগ্‌ধারাগত পার্থক্য আছে। তবে মূলভাষা ও তার উপভাষার মধ্যে পার্থক্য এমন সুস্পষ্ট হবে যাতে আঞ্চলিক ভাষারূপের স্বাতন্ত্র্যটি বজায় থাকবে। ঐ পার্থক্য কখনোই এমন বেশি হবে না, যাতে আঞ্চলিক ভাষাও একটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা হয়ে ওঠে বা পারস্পরিক বোধগম্যতা হারিয়ে ফেলে। ভাষা ও উপভাষার পার্থক্যটি তাই শ্রেণিগত নয়, মাত্রাগত এবং চূড়ান্ত নয়, আপেক্ষিক।[৭] উদাহরণস্বরূপ বাংলা ও অসমিয়া ভাষার কথা বলা যায়। এই ভাষা দুটি প্রথমে একটি ভাষার দুটি উপভাষা ছিল, কিন্তু ক্রমে ভাষা দুটির আঞ্চলিক পার্থক্য বেড়ে যাওয়ায় দুটিই স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে পরিচিত লাভ করেছে।[৮] অথচ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে প্রচলিত বাংলা ভাষা পারস্পরিক বোধগম্যতার কারণেই দুটি স্বতন্ত্র ভাষা নয়। ভাষার সঙ্গে উপভাষার পার্থক্য ঘটে মূলত উচ্চারণগত, ধ্বনিগত ও রূপগত কারণে। ভাষার যেমন সর্বজনীন ব্যবহার, উপভাষার ব্যবহার তেমনটি নয়। উপভাষাকে বলা যেতে পারে ভাষার উপবিভাগ।[৯] সাধারণত একটি ভাষা উপভাষার চেয়ে বৃহৎ ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত হয়ে থাকে। উপভাষা ভাষা থেকে বিভিন্ন বা পৃথক নয়, কিন্তু ভাষা থেকে অনেকাংশে আলাদা।

এ প্রসঙ্গে উপভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার ধারণা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। সকল আঞ্চলিক ভাষাই উপভাষা নয়। যে সকল আঞ্চলিক ভাষার একটি ব্যাকরণ-কাঠামো রয়েছে, কেবল সেসব আঞ্চলিক ভাষাই উপভাষা। যেমন নোয়াখালির আঞ্চলিক ভাষাকে

আমরা উপভাষা হিসাবে উল্লেখ করতে পারি। কিন্তু ঢাকা শহরে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তা ঢাকা শহরের আঞ্চলিক ভাষা, উপভাষা নয়। বর্তমানে উপভাষা শব্দটি শুধু আঞ্চলিক ভাষিক বৈচিত্র্যেরই নির্দেশ করে না, বরং বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার ভাষাও নির্দেশ করে, যেমন—'উকিলের উপভাষা', 'চোরের উপভাষা', 'আমলার উপভাষা', 'ব্রাহ্মণের উপভাষা' 'মাঝির উপভাষা' ইত্যাদি। প্রতিটি শ্রেণি ও পেশার ভাষার মধ্যে রূপায়িত হয় শ্রেণিগত ও পেশাগত বৈশিষ্ট্য। তারা একই উপভাষী হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে রূপায়িত হল শ্রেণিগত ও পেশাগত বৈশিষ্ট্য। তারা একই উপভাষী হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে স্পষ্ট পেশাগত ও শ্রেণিগত স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। শ্রেণি ও পেশাগত ভাষিক বৈশিষ্ট্যের কারণে উপভাষা ক্রমান্বয়ে পরিণত হয় সমাজভাষাবিজ্ঞানে[১০] যেটি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা।

উপভাষাচর্চা ঃ প্রয়োগনীয় প্রসঙ্গ

উপভাষা অনেকের কাছেই শ্রদ্ধেয় নয়। সারা বিশ্বে উপভাষার প্রতি মানুষের অবজ্ঞার ভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেকের কাছেই উপভাষা বিকৃত ভাষা, অনুন্নত ভাষার নামান্তর। কেউ মনে করেন, এটি মান্যভাষার বিকৃতির ফল।[১১] অথচ যে কোনো উপভাষা উপযুক্ত পরিবেশ পেলে হয়ে উঠতে পারে মান্যভাষা। উপভাষা-গবেষণা ও মান্যভাষা-গবেষণার মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। মান্যভাষার বিভন্ন স্তর, যেমন-ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণা সম্ভব, ঠিক সেই সমস্ত সম্পর্কেই সম্ভব উপভাষা-গবেষণা।[১২] এক সময় ধারণা করা হত শিষ্ট বা স্ট্যান্ডর্ড ভাষাই বিশুদ্ধ আর আঞ্চলিক ভাষা বিকৃত বা অশুদ্ধ। কিন্তু সে ধারণার আজ অবসনা ঘটেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো ভাষার শিষ্ট বা স্ট্যান্ডার্ড রূপ একটি সামাজিক উপভাষা ছাড়া আর কিছু নয়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে কোনো ভাষায় একটি বিশেষ রূপ বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকে এবং সেটি শিষ্টরূপে গৃহীত হয়। স্মর্তব্য, প্রায়শই ভাষার এই আধুনিক শিষ্ট রূপটি কৃত্রিম বা মিশ্রিত হয়ে থাকে, তুলনামূলকভাবে ভাষার আঞ্চলিক বা গ্রাম্য বা লোকরূপের মধ্যেই ভাষার প্রাচীন রূপ কিছুটা হলেও অবিকৃত থাকে, অর্থাৎ ভাষার পরিবর্তন শিষ্টরূপ অপেক্ষা আঞ্চলিকরূপে অনেক্ষাকৃত কম ঘটে থাকে। তাই ভাষার ইতিহাস পুনর্গঠনে আঞ্চলিক রূপ বা উপভাষার বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজন।

মিশ্র সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের কারণে কোনো বিশেষ উপভাষার শেষসীমা পাওয়া তো দূরে থাক, তার সূচনা কোথায় তাও বোঝা যায় না।[১৩] ভিন্ন দুই ভাষার মতোই ব্যবধান দেখি দুই উপভাষায়। যেমন কুমিল্লা-নোয়াখালি-চট্টগ্রামের উপভাষাগুলোর তুলনা করলে দেখা যায়, নোয়াখালির আনুনাসিকতা কুমিল্লায় যেমন অপরিচিত, তেমনি এর মূর্ধন্য ও তাড়নাগত ধ্বনির ব্যবহার প্রবণতা চট্টগ্রামে অনুপস্থিত। চট্টগ্রামের অক্ষর ঝোঁক, হ-উহ্যতা এবং আন্তঃস্বরীয় ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ বা দ্বিত্বতা ও তৎসম শব্দগঠনে সংকোচন-সংক্ষেপণ প্রবণতাই বাংলাদেশের অপরাপর ভাষা থেকে একে পৃথক করেছে।

আবার ফরিদপুরের অপিনিহিতি যশোর কুষ্টিয়ার সাধারণ ধর্ম নয়। বাংলা ভাষার এইরূপ বহু আঞ্চলিকতার জন্য লেখ্যরূপের সঙ্গে এর পার্থক্য বিস্তর। এরূপ আঞ্চলিক বৈচিত্র্যভরা অঙ্গ নিয়ে যে ভাষার প্রকৃতি গড়ে উঠেছে, লেখ্যরূপে প্রাপ্ত দলিলে তার ঐতিহাসিক বিবর্তনের পার্শ্বচিত্র বা বিবরণ জানা যায়। অর্থাৎ বলা যায়, ভাষার লুপ্ততথ্য তার উপভাষায় সন্ধানযোগ্য।

মানুষ উপভাষা ব্যবহার করে পূর্বজীবনের সঙ্গে একাত্মতার বোধে প্রাণিত হয়ে। এভাবেই এই ভারতভূমির পশ্চিমবঙ্গে আজও কেউ কেউ বাংলাদেশের বিশিষ্ট উপভাষা ব্যবহার করেন, অন্তত গৃহগত পরিমণ্ডলে।[১৪] তাছাড়া উপভাষার রূপমূলে নির্দিষ্ট গঠন-প্রকৃতি থাকে বলে রূপমূলের মাধ্যমে অনেক অজানা তথ্য পাওয়া যায়, যেমন—মানুষের জীবন, জীবিকা, সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদি। তাই মানুষের সামাজিক দিকটি নির্ণয় করার জন্য বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানে উপভাষা বিশ্লেষণ অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে।

উপভাষা : দেশগতভাবে বিভাজন ও বর্গীকরণ

বাংলা ভাষার দেশগতভাবে পূর্ব-পশ্চিম বিভাজনের অন্যতম প্রধান ভাগটিকে বলা হল 'বঙ্গালি' উপভাষা।[১৫] উপভাষার এই ভাগকে Eastern Group, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রাচ্য, সুকুমার সেন, অতীন্দ্র মজুমদার, রামেশ্বর শ' 'বঙ্গালি' এবং পরেশচন্দ্র মজুমদার 'বঙ্গীয়' উপভাষা নামে চিহ্নিত করেছেন। অতীন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন, ময়মনসিংহ থেকে শুরু করে ঢাকা, ফরিদপুর হয়ে বরিশাল পর্যন্ত অঞ্চলের মুখ্য উপভাষা 'বঙ্গালি'। একসময় বাংলাদেশে ভাষার লিখিত রূপের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হত। বর্তমানের সে ধারণায় পরিবর্তন এসেছে। এখন ভাষার লিখিত রূপের চেয়ে মৌখিক রূপ বর্ণনা করা বাংলাদেশের ভাষাবিজ্ঞানীদের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে তাঁরা উপভাষা চর্চায় ঔৎসুক্য নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশের উপভাষা চর্চার গতি-প্রাকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা একটু পিছনে ফিরে স্মরণ করতে পারি পর্তুগিজ ধর্মযাজক মনো এল দ্য আস্‌সুম্পসাঁও-এর কথা। তিনি ১৭৩৪ খিস্টাব্দে *ভোকাবুলারিও এম্ ইদিওমা বেনগল্লা ও পর্তুগিজ* নামক বাংলা ভাষার যে প্রথম ব্যাকরণটি ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগনায় (বর্তমান ঢাকার নিকটবর্তী গাজীপুর জেলা) বসে রচনা করেছিলেন তাতে ভাওয়াল অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল।

১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত উক্ত লেখকের *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ* গ্রন্থেও ভাওয়ালের উপভাষা ব্যবহৃত হয়। দুশো আশি বছর পূর্বে বাংলাদেশে বাংলা উপভাষার রূপ কেমন ছিল তার যৎকিঞ্চিৎ নমুনা মনো এলে *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ* গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থটির গুরু-শিষ্যর কথোপকথন মাত্র। নমুনাটি আমরা আলাদা চার্টে (চার্ট-১) লিপিবদ্ধ করে দেখিয়েছি।

চার্ট-১

শি : পূজা হোক সিদ্ধি পরম নির্মল ধর্ম

গু : তিনি তোমার আশীর্বাদ দেক, এবং তোমার ভাল করুক, আইস পোলা, তুমি কৌ?

শি : আমি খ্রীস্তাও, মুটা, পরমেশ্বরের কৃপায়।

গু : কোথায় যাও? শহুরে না বারিতে?

শি : বারিতে যাই।

গু : তোমার বারি কোথায়?

শি : ভাওয়াল দেশে; আমি তোমার রাইয়ত। নাগরিতে বসি। ভাই-বইন হগল গেছে।

গু : আমি তো সেখানে যাই। আমার সঙ্গে আইস, হয়ত শাগ-ভাত জুটবে।

গ্রন্থটিতে গুরু-শিষ্যের সংলাপ থেকে শতাধিক বছর পূর্বে বাংলাদেশের উপভাষার নিম্নরূপ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় :

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

ক. পশ্চাৎ নিম্নমধ্য গোলাকৃতি 'অ' স্বরধ্বনির স্থানে পাশ্চাৎ উচ্চ গোলাকৃতি 'উ' ধ্বনি, যেমন শহর > শুহর।

খ. পশ্চাৎ উচ্চ মধ্য গোলাকৃতি 'ও' ধ্বনির স্থানে পশ্চাৎ উচ্চ গোলাকৃতি 'উ' ধ্বনি, যেমন—মোটা > মুটা।

গ. অঘোষ স্বপ্নপ্রাণ স্পৃষ্ট কণ্ঠ 'ক' ধ্বনির স্থানে ঘোষ স্বল্পপ্রাণ 'গ' ধ্বনি, যেমন-শাক > শাগ।

ঘ. শব্দের আদি অবস্থানে উষ্ম তালব্য ব্যঞ্জন 'স/শ' স্থানে 'হ', যেমন—সকল > হগল।

ঙ. শব্দ মধ্যে 'ই' ধ্বনির আগমন, যেমন—বোন > বইন।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

ক. কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তির ব্যবহার, যেমন 'মাইয়াএ মরিয়া গেল।'

এছাড়া বাক্যরীতিতেও পূর্ববঙ্গীয় (অর্থাৎ বাংলাদেশের) উপভাষারীতি পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন—'আইস পোলা তুমি কেটা?

উক্ত গ্রন্থে পূর্ববাংলার উপভাষায় ব্যবহৃত অনেক শব্দের পরিচয় মেলে, যেমন—ছাওয়াল, মাইয়া, পোলা, লগে ইত্যাদি।

[সূত্র : হুমায়ুন আজাদ (সম্পাঃ), *বাঙলা ভাষা* (দ্বিতীয় খণ্ড) ঢাকা ঃ আগামী, ২০০৯), পৃ.৩৩২]

এখন আসা যাক, উপভাষার বর্গীকরণ প্রসঙ্গে। বাংলা উপভাষার বর্গীকরণে যাঁর নাম সর্বপ্রথম স্মরণযোগ্য তিনি জর্জ গ্রিয়ার্সন।[১৬] বাংলা ভাষার আঞ্চলিক-বৈচিত্র্য বা উপভাষা-বৈশিষ্ট্য নিয়ে সামগ্রিক আলোচনায় জর্জ গ্রিয়ার্সনের *লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া* (১৯০৩-১৯২৮) গ্রন্থটি পথিকৃৎ। গ্রিয়ার্সনের প্রাথমিক ধারণা ছিল, প্রতি দশ ক্রশে ভাষা বদলায়। তিনি সমগ্র বাংলা ভাষার এলাকার মধ্যে ৪৪টি বৈচিত্র্য দেখান।

পরে এগুলোকে ২টি প্রধান ভাগে (পশ্চিমী ও পূর্বী) এবং ৪টি উপবিভাগে বিন্যস্ত করেন। গ্রিয়ার্সন অবলম্বনে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাংলাদেশের বাংলা ভাষার নিম্নোক্ত উপভাষা-শ্রেণি উল্লেখ করেছেন যা চার্ট-২-এ দেখানো হয়েছে।

চার্ট-২

১. উত্তরবঙ্গীয় : দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা।
২. রাজবংশী : রংপুর।
৩. পূর্ব-বঙ্গীয় :
   ক. ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, বরিশাল, পটুয়াখালি, সিলেট।
   খ. ফরিদপুর, যশোর, খুলনা।
৪. দক্ষিণবঙ্গীয় : চট্টগ্রাম, নোয়াখালি।

[সূত্র : হুমায়ুন আজাদ (সম্পা), *বাঙলা ভাষা* (দ্বিতীয় খণ্ড) (ঢাকা : আগামী, ২০০৯), পৃ. ৩৩৩]

উল্লেখ্য, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গ্রিয়ার্সনকৃত বাংলা উপভাষার প্রাচ্য বিভাগকে পূর্বদেশীয় ও দক্ষিণ-পূর্ব শাখায় বিভক্ত করেছিলেন, যা চার্ট-৩ এ দেখান হল।

চার্ট-৩

১. পূর্বদেশী : ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বাখরগঞ্জ, দক্ষিণ-পূর্ব ফরিদপুর, সিলেট।
   ক. এরই একটি প্রশাখা—পূর্বকেন্দ্রিক-যশোর, খুলনা, ফরিদপুর (দক্ষিণ-পূর্বাংশ ব্যতীত)
   খ. আর একটি প্রশাখা—হজাং (ময়মনসিংহ জেলা)
২. দক্ষিণ-পূর্ব : নোয়াখালি, চট্টগ্রাম
   ক. এর একটি প্রশাখা-চাকমা

[সূত্র : হুমায়ুন আজাদ (সম্পা.) *বাঙালা ভাষা* (দ্বিতীয় খণ্ড) (ঢাকা : আগামী, ২০০৯), পৃ. ৩৩৫]

গ্রিয়ার্সনের উপভাষা বিভাগ সম্পর্কে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের ভূমিকায় যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ করার প্রয়োজন বলে মনে করছি। মন্তব্যটি এমন: 'গ্রিয়ার্সন সাহেব এ সমস্ত বিভাগ, শাখা ও প্রশাখার বিশিষ্ট লক্ষণগুলো বিস্তৃতরূপে প্রদর্শন করেন নাই; কিন্তু ইহার প্রয়োজন আছে।'

এখানে বলা প্রয়োজন, গ্রিয়ার্সনের উপাদান বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত তথ্যভিত্তিক নয়। যেমন ঢাকা জেলা থেকে তিনি কেবল মানিকগঞ্জের নমুনা সংগৃহীত করেছিলেন, ঢাকা শহরে প্রচলিত উপভাষার নমুনা সেখানে নেই। ফলে গ্রিয়ার্সনের জরিপে আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপভাষার সীমানা নির্ণয় ও ভাষাতাত্ত্বিক

বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটন বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণাঙ্গ নয়। এক্ষেত্রে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর শ্রেণিবিভাগ অনেকটাই পূর্ণাঙ্গ। তবে শহিদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর শ্রেণিবিভাগকে বাংলাদেশের অধিকাংশ উপভাষা গবেষক আদর্শ হিসাবে মান্য করেন।

উপভাষার বৈশিষ্ট্য-অনুসন্ধান : পরিপ্রেক্ষিত বাংলদেশ

বাংলাদেশের উপভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি তাৎপর্যপূর্ণ ও কৌতুহলোদ্দীপক।[১৭] এখানকার উপভাষাসমূহে ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যই অধিক এবং তা তিনটি ক্ষেত্রে সর্বাধিক, যেমন-সর্বনাম, কারক-বিভক্তি ও ক্রিয়া-বিভক্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সর্বনামে 'আমি'র উপভাষারূপ উত্তরবঙ্গে 'মুই', নোয়াখালি অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গে 'আঁই'। 'আমার' উত্তরবঙ্গে 'মোর', নোয়াখালিতে 'আঁর'। 'আমাদের' উত্তরবঙ্গে 'হামার', ময়মনসিংহ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে 'আমরার', কুমিল্লা অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে 'আমাগো', বরিশালে 'মোগো', দক্ষিণবঙ্গে 'আমরার'। কারক-বিভক্তির ক্ষেত্রে—'চাকরদের' উত্তরবঙ্গে 'চাকরদেক', পূর্ববঙ্গে 'ছাঅরগো', দক্ষিণবঙ্গে 'ছঅরগুণ'। ক্রিয়া-বিভক্তির ক্ষেত্রে 'বলব' উত্তরবঙ্গে 'বলিব', পূর্ববঙ্গে 'কমু', দক্ষিণবঙ্গে 'খইয়ুম'। বাংলাদেশের উপভাষার অঞ্চলভিত্তিক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি বিচারে দেখা যাবে বৈচিত্র্যের সমাহার। মুনীর চৌধুরীর শ্রেণিকরণ অনুসরণে বাংলদেশের উপভাষাগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি তুলে ধরা হল। উল্লেখ্য, আমাদের বর্ণনা ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

বাংলাদেশের উপভাষার অঞ্চলভিত্তিক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি চার্টে (চার্ট-৪) উপস্থাপন করা হল।

চার্ট-৪

উত্তরবঙ্গীয় (দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা)

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

ক. তাড়নজাত মূর্ধন্য ব্যঞ্জন 'ড়' স্থানে দন্ত্য 'র', যেমন- বড়> বর।

খ. তাড়নজাত দন্ত্য 'র' স্থানে পার্শ্বিক 'ল', যেমন-শরীর > শরীল।

গ. রাজশাহী অঞ্চলে বিশেষত চাঁপাইনবাবাগঞ্জ অঞ্চলে উষ্ম তালব্য 'শ' ও উষ্ম দন্ত্য 'স' ধ্বনির মধ্যে বেশ বিভ্রান্তি দেখা যায়, যেমন-শাবাশ > সাবাস।

রূপাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

ক. কর্তৃকারকে বহুবচনে 'তে' বিভক্তি—চাওতে; কর্মে 'দেক', যেমন—চাকরদেক; গৌণকর্মে 'গুণে'—আমাকগুণে; অপাদানে 'ত', যেমন-দেশত।

খ. ক্রিয়াপদে অসমাপিকা 'এ্যা', যেমন-কর‍্যা, হয়্যা; উত্তমপুরুষে ভবিষ্যৎকালে 'ইম', 'আম', যেমন-বলিম, করিম।

রাজবংশী (রংপুর)

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

ক. 'ও' ধ্বনি 'উ' ধ্বনিতে রূপান্তর ঘটে, যেমন—কোন > কুন।

খ. 'ভ' ধ্বনি 'ব' ধ্বনির উচ্চারণ রূপ পায় এবং 'ই' ধ্বনি 'হ' তে রূপান্তরিত হয়, যেমন—ভাই > বাহে।

গ. 'র' ধ্বনি 'অ' ধ্বনিতে রূপান্তর, যেমন—রংপুর > অংপুর

রূপাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

ক. কর্তৃকারক বহুবচনে 'গুলা', 'গিলা', যেমন-বালাকগুলা; কর্মকারকে 'ক' এবং 'কার', যেমন—বালককার অপানাদ কারকে 'অত' এবং 'ওত', যেমন—বালকত্।

খ. ভবিষ্যৎকালে 'ম', 'মু', 'মো', যেমন—থাকম, থাকিমু, থাকমো; দ্বিতীয় পুরুষে অতীতে 'লু', 'ল্লু', যেমন—তুই কইল্লু; ভবিষ্যৎকালে দ্বিতীয় পুরুষে 'বু', যেমন—তাই করবু।

পূর্ববঙ্গী (ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, বরিশাল, পটুয়াখালি, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, সিলেট)

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

ক. অপিনিহিত স্বর রক্ষিত, যেমন—রাখিয়া > রাইখ্যা, কান্দিয়া > কাইন্দা।

খ. অর্ধ-সংবৃত 'এ' (e) ধ্বনি অর্ধ-বিবৃত অ্যা (æ) ধ্বনিরূপের উচ্চারিত, যেমন—লোপ > ল্যাপ, এবং > এ্যাবং, শেষ > শ্যাষ্।

গ. 'ড়', 'ঢ়' ধ্বনি 'র' তে পরিণত, যেমন—বাড়ি > বারি, দৃঢ় > দৃর।

ঘ. 'শ', 'ষ', 'স' ধ্বনি 'হ' রূপে উচ্চারিত, যেমন—শালা > হালা, সকল > হগল।

ঙ. পদের আদিতে কিংবা মধ্যস্থিত হ-কার 'অ' রূপে উচ্চারিত, যেমন—হয় > অয়, হইবে > অইবে।

চ. 'এ' স্থলে 'ই', যেমন—মধ্যে > মদ্দি।

ছ. 'ই' এর নিম্নধ্বনিতে রূপান্তর, যেমন-পাইলাম > পালাম।

জ. 'ব' স্থলে 'প', যেমন—বাঁচবেনা > বাঁচপেনা।

ঝ. 'ও' কার স্থলে 'উ' কার, যেমন—বোন > বুন।

ঞ. 'টা' 'ডা' তে পরিণত হয়, যেমন—কয়টা > কয়ডা।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

ক. কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি যেমন—বাপে ডাকে, মায়ে ডাকে; কর্মকারকে 'এরে', 'রে' বিভক্তি, যেমন—বাপের ডাকে; সম্বন্ধের বহুবচনে 'গো', যেমন—তাগো; কর্মের বহুবচনে 'রারে', যেমন—আমারারে।

খ. ক্রিয়াপদের রূপ প্রথম পুরুষে ভবিষ্যৎকালে 'মু', যেমন—কামু (বরিশাল); ময়মনসিংহে 'আম', যেমন—কয়বাম; কুমিল্লায় দ্বিত্ব, যেমন—বইল্লা, উইঠ্ঠা।
গ. বিশেষ থেকে ক্রিয়া গঠিত, যেমন—তাপ > তাপানো (পোহানো)
ঘ. প্রশ্নবোধক বাক্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির তাগিদে ক্রিয়া বিশেষ্যের পূর্বে বসে, যেমন—দেচ্চো নাহি টাহা কডা? (দিচ্ছ তো টাকা কয়টা)?

দক্ষিণবঙ্গীয় (চট্টগ্রাম, নোয়াখালি)

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

ক. আনুনাসিক ধ্বনির আধিক্য, যেমন—আমি > আঁই।
খ. স্বতোনাসিক্যীভবন, যেমন—টাকা > টেআঁ।
গ. 'উ' ধ্বনি কখনো 'ও' ধ্বনিরূপ পায়, যেমন—সুন্দর > সোন্দর।
ঘ. শব্দের আদিতে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন—'ক', 'প' জিহ্বামূলীয় ও উষ্মবর্ণ 'খ' ও 'ফ' রূপে উচ্চারিত হয়, যেমন—কালীপূজা > খালীফূজা।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

ক. চট্টগ্রামে কর্তৃকারকে 'এ', অপাদান কারকে 'তুন'; সম্বন্ধে 'অর'; বহুবচনে 'গুণ'; 'উন' ব্যবহৃত হয়, যেমন—কুঁউরগুন।
খ. বর্তমানকালে প্রথম পুরুষে 'ব'; তৃতীয় পুরুষে 'তান'; দ্বিতীয় পুরুষে (গ) 'ইয়'; তৃতীয় পুরুষে '(গ) ইয়া'; ভবিষ্যৎকালে '(গ) ইউম' (আঁই যাইউম)।
গ. অনুজ্ঞা 'অ' না বাচক 'ইঅ', যেমন—নকরিঅ।

বাংলাদেশে উপভাষাচর্চা : বিবেচনা ও বিচারের ধারণা

উপভাষা চর্চার ইতিহাস প্রাচীন। কোনো আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্ন ভাষারূপের সমীক্ষাই হচ্ছে উপভাষাতত্ত্ব।[১৮] এই সমীক্ষায় ধ্বনি, উচ্চারণ ও রূপমূলের পার্থক্যের উপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। দুটি ভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা হয়। ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় উপভাষা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ভাষার শব্দ, অর্থ, উচ্চারণ, শব্দগঠন-প্রকৃতি ও বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রাধান্য পায়। এর সঙ্গে উপভাষায় মানচিত্র ও অভিধান সংকলনের প্রতিও গবেষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রথম দিকের গবেষণায় শব্দ বিচার প্রাধান্য পেলেও পরবর্তীকালে শব্দ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পাশাপাশি অন্যান্য দিকও অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। তবে এ সবের গতি ধীর এবং যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

বাংলাদেশের উপভাষাচর্চার ক্ষেত্রে দুঃখজনক হলেও সত্য, গ্রিয়ার্সনের সরল আদর্শ বা মডেল বিপুল তথ্যরাশির মাঝে উপভাষার বিশ্লেষণ স্বল্পতা আমাদের বাংলাদেশের নবিশী গবেষকগণের অনুসন্ধানী করেনি এবং সেই স্বল্পতা বিস্তৃতিতে তাঁদের মনোযোগও

আকর্ষণ করেনি।[১৯] বিকল্পে তাঁরা সামান্য পরিপূরক তথ্য সংযোজনের দিকেই নিজেদেরকে নিয়ত উৎসাহিত করেছেন। তথ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি অপেক্ষা পদ্ধতির বিশাল আবিষ্কার ও লক্ষ্য পরিবর্তন তাঁদের কাছে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এরই ফলে এই পর্যায়ে আমরা কিছু আঞ্চলিক ব্যাকরণ পেয়েছি, যেগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য ব্যতিত অন্য গুরুত্ব নিতান্তই কম। *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ* পত্রিকায় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৯), বসন্তরঞ্জন রায় (১৯১৯), পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী (১৯১০) এবং পরে আবদুর রশিদ সিদ্দিকী (১৯৩৩), ডক্টর মুহম্মম এনামূল হক (১৯৩৫), আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ওহীদুল আলম (১৯৮২) প্রমুখ চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার ব্যাকরণিক তথ্য প্রকাশ করেন। এদেরকে 'চট্টগ্রামী স্কুল' ও বলা হয়ে থাকে। অবশ্য এ কথা সত্য, এঁরা সবাই জাত সংস্কৃতির উজ্জীবনের আশায় উপভাষার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে উৎসাহী হন।

গ্রিয়ার্সনের পর কিছুটা সময় এমনিতেই কেটে যায়। পরবর্তীকালে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গ্রিয়ার্সনের অপূর্ণতা কিছুটা হলেও পূরণ করেন। শহীদুল্লাহ উপাদান সংগ্রহ করেন বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চল থেকে। তিনি উপভাষাগুলোর নতুন নতুন ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উপস্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বলেন, 'বঙ্গালি' উপভাষার স্বরধ্বনি-ব্যবস্থা অধিকতর রক্ষণশীল এবং স্বরমধ্যবর্তী মহাপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণহীনতার ফলে বঙ্গ উপভাষাগুলোতে নতুন বৈশিষ্ট্যের আগমন ঘটেছে। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার উপভাষাগুলোতে আদ্য ও মধ্য অবস্থানে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের ব্যাপক উষ্মীভবন একটি বিশেষ লক্ষণ এবং এই বৈশিষ্ট্যই বঙ্গ উপভাষাগুলোকে বাংলার অন্যান্য উপভাষা থেকে পৃথক করেছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, বাংলাদেশে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার এক পর্যায়ে ঔপভাষিক তথ্যের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভাষা গবেষক মুহম্মদ আবদুল কাইউম বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়নের আদি ইতিহাস সন্ধান করতে গিয়ে লক্ষ করলেন, হ্যালহেড প্রমুখ ব্যাকরণবিদগণের মুসলমান মুন্সিরা প্রায়শই শব্দ সংগ্রহ করতেন এবং তার উপর ভিত্তি করে অনেক ওয়ার্ডশীট বা শব্দতালিকা প্রণয়ন করতেন। বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৬২ সালে একটি ওয়ার্ডশীট তৈরি করা হয় এবং তদভিত্তিক সংগৃহীত শব্দ ও ভাষাতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক তথ্য নিয়ে শব্দের ব্যুৎপত্তিসহ আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকৃত প্রস্তুত করা হয়। অভিধানের জন্য প্রথমে ছিয়ানব্বই জন সংগ্রাহক প্রায় একুশ হাজার শব্দ সংগ্রহ করে পাঠিয়েছিলেন। পরে আবার চারশত তিপান্নাজন সংগ্রাহক এক লক্ষ ছেয়াট্টি হাজার দুইশত ছেচল্লিশটি আঞ্চলিক শব্দ প্রেরণ করেন। সংগ্রাহকদের অধিকাংশ ছিলেন অধ্যাপক ও শিক্ষক, এক চতুর্থাংশ ছাত্র, আর এক চতুর্থাংশ বিভিন্ন কর্মজীবী।

এ অভিধানে বাংলাদেশের সব জেলা থেকেই আঞ্চলিক শব্দ সংগৃহীত হয়েছে। ঢাকা শহরে অবস্থানকারী সংগ্রাহকেরাই ছিলেন সংখ্যাধিক্য, তারপরও তাঁরা বিভিন্ন জেলা

থেকে শব্দসংগ্রহ করে পাঠিয়েছিলেন। ঢাকা শহরের বাইরে বিভিন্ন জেলায়ও সংগ্রাহকগণ নিরলস কাজ করেছেন। তবে একথা সত্য যে, অধিকাংশ সংগ্রাহকই স্বল্প ধ্বনিতত্ত্বজ্ঞান ও প্রক্ষিশণহীন। ফলে শব্দের যথাযথ উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করা বা সংগৃহীত শব্দাবলির মধ্যে যথাযথ ধ্বনিবৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়নি। এ কারণে সংগৃহীত শব্দের মধ্যে পঁচাত্তর হাজারের বেশি শব্দ রাখা সম্ভব হয়নি। এ অভিধানটির ভূমিকায় বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষার শ্রেণিবিন্যাস বা বিভিন্ন উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না এবং সংগৃহীত শব্দাবলির ভিত্তিতে। কোনো ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণও এখানে সংযোজিত হয় নি।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম বাংলা উপভাষাচর্চায় বিশেষ স্মরণযোগ্য। তিনি পূর্ববঙ্গীয় অর্থাৎ বাংলাদেশের উপভাষা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে কিছু কিছু সমস্যার অবতারণা করলেও উপভাষার স্বতন্ত্র বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর ও সুকুমার সেনের ছাত্রদের হাতেই। এসকল ছাত্র মূলত গ্রিয়ার্সন ও সুনীতিকুমারের আদর্শেই উদ্বুদ্ধ ছিলেন। মুহম্মদ আবদুল হাই এঁদের মধ্যে অন্যতম, বলা যায় fountain head। তাঁর উপভাষা বিষয়ক রচনার সংখ্যা খুব বেশি না হলেও পরবর্তীকালে যাঁরা এ বিষয়ে কাজ করেছেন তাদের কাছে এগুলো অনুপ্রেরণা ও দিশা হিসাবে কাজ করেছে।

মুহম্মদ আবদুল হাই-এর পর এই ধারার একটি ক্রমাগ্রসরতা লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এই ধারাটি আরো স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।[২০] ঢাকার উপভাষা বিষয়ক আলোচনাগুলো এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। *দৈনিক পয়গামে* ঢাকায় কুট্টিদের উপভাষা নিয়ে ডক্টর কাজী দীন মুহ ম্মদের রচনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও এটি এই ধারার একটি চমৎকার প্রয়াস। তাঁর প্রবন্ধে উপভাষার কিছু মৌলিক সমস্যার কথা উত্থাপিত হয়েছে। নোয়াখালির উপভাষা নিয়ে কাজ করেছেন গোপাল হালদার, চট্টগ্রামের উপভাষা নিয়ে ড. মুহম্মদ এনামুল হক। মুনীর চৌধুরী পূর্ববঙ্গের উপভাষা নিয়ে কাজ করেছেন। ভারতের নাগরিক অনিমেষ পাল ঢাকায় উপভাষা নিয়ে পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ রচনাকালে মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সহযোগিতা লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশের উপভাষার মহাপ্রাণতা সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে ড. মনিরুজ্জামান সম্পাদিত *নিসর্গ* পত্রিকার ভাষাতত্ত্ব সংখ্যায় বাংলা ১৩৮০ সালে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। অনিমেষ পালের প্রতিপাদ্য ছিল 'উঠতি স্বর' বা 'আরোহী স্বর'। অবশ্য এ প্রসঙ্গে পরে বিস্তৃত আলোচনা করেন ড. মনিরুজ্জামান ১৯৭৪ সালে জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সর্বভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিক সম্মেলনে দীর্ঘ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। মনিরুজ্জামানই প্রথম উপভাষাভিত্তিক পুনর্গঠন এবং ঔপভাষিক ভূ-চিত্রণের কাজ শুরু করেন। এছাড়া তিনি উপজাতীয় ভাষার বিশ্লেষণেও কাজ করেছেন। তাঁর উপভাষা চর্চার লক্ষ্য জরিপি দৃষ্টিতে উপভাষা পরিস্থিতি বর্ণনা এবং সমাজ ভাষাতাত্ত্বিক প্রকরণ ও সূত্রাদির আলোকে বাংলাদেশের উপভাষাগুলোর বৈচিত্র্য-অনুসন্ধান করা।

উপভাষা গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষক ও বিশিষ্ট সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানী ড. রফিকুল ইসলামের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণা পত্রিকা *সাহিত্য পত্রিকার* শীত সংখ্যা ১৩৮৫ সালে 'উপভাষাতত্ত্ব ও বাংলাদেশের উপভাষা বিশ্লেষণ' শীর্ষক প্রবন্ধটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ প্রবন্ধে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে পূর্বসূরীদের কাজের ধারাকে বিশেষভাবে লক্ষ করা হয়েছে। বাংলা একাডেমির প্রাক্তন মহাপরিচালক মনসুর মুসা কিছুকাল আবদুল হাই-এর সঙ্গে চট্টগ্রামী উপভাষা নিয়ে গবেষণায় নিরত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায় ১৩৮৮ সালে তাঁর 'চট্টগ্রামের উপভাষা : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, চট্টগ্রামের উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের যাবতীয় খুঁটিনাটি এ প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে।

এ সকল উপভাষা আলোচনাতে একদিকে যেমন জরিপি দৃষ্টিতে ভাষার সাংগঠনিক রূপের বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে নির্দিষ্ট উপভাষার প্রকৃতিসঙ্গত বিস্তার বা সমাজগত সমস্যার কথাও বাদ দেওয়া হয়নি। ফলে অতিরিক্ত ধ্বনিমূল তথা ধ্বনির ব্যবস্থা, ব্যবহারবিধি ও কার্যমূলের প্রসঙ্গও নির্দেশিত হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই, মুহম্মদ আবদুল হাই-এর অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশে উপভাষা চর্চার ক্ষেত্রটি বিস্তৃত হলেও গবেষণার বিষয় নির্ধারণে বৈচিত্র্য আসতে অনেকটা সময় কেটে যায়। পরবর্তীকালে উপভাষা গবেষণায় এগিয়ে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। তিনি চট্টগ্রামের উপভাষা নিয়ে কাজ করেছেন। সন্দ্বীপের উপভাষা নিয়ে কাজ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক স্বনামধন্য শিক্ষক রাজীব হুমায়ুন।

এরপর বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল সম্পর্কিত উপভাষা চর্চার ক্ষেত্রটি ধীরে ধীরে আরো সমৃদ্ধ হয়, যেমন—দিনাজপুরের ভাষা নিয়ে মোহাম্মদ সোলায়মানের 'দিনাজপুরের আঞ্চলিক ভাষার রূপরেখা' (*মাসিক পুবালী*, ১৯৭১), আলমগীর জলিলের 'দিনাজপুরের লোকভাষা' (*মোহম্মদী* ৩৫ বর্ষ ৬ সংখ্যা চৈত্র ১৩৭০) প্রভৃতি। রাজশাহীর ভাষা নিয়ে সাদেক আলীর 'বরেন্দ্র উপভাষা' (*মাহেনও*, অক্টোবর ১৯৫৪), খোন্দকার আব্দুর রহীমের 'গৌড়ীয় উপভাষা' (*সাহিত্যিকী* ১৩৮৮), আলমগীর জলিলের 'রাজশাহী জেলার উপভাষা' (*ইত্তেফাক*, বৈশাখ ১৯, ১৩৭১), আমিনুল হকের 'রাজশাহীর লোককথার ভূমিকা' (*আজাদ*, ফাল্গুন, ২৩, ১৩৭০), পি. এম সফিকুল ইসলামের 'রাজশাহীর উপভাষা' (*বাংলা একাডেমি*, ঢাকা, ১৯৯২) প্রভৃতি। বগুড়ার উপভাষা নিয়ে আলমগীর জলিলের 'বগুড়ার লোকভাষা' (*মোহম্মদী* ৩৪ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৬৯, ৩৫ বর্ষ ১ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৭০), পাবনার ভাষা নিয়ে এ হান্নানের 'পাবনার কথ্য ভাষা' (*করতোয়ার গতিপথে*, ১৩৭৫)। রংপুরের ভাষা নিয়ে সুরেশচন্দ্র রায় চৌধুরীর 'রংপুরের দেশীয় ভাষা' (*বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা*), শ্রী প্রদীপ বিকাশ চৌধুরীর 'রংপুরের লোকসাহিত্যের ভাষার বৈয়্যকরণিক পরিচয়' (*বাংলা একাডেমি* পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৭), আলমগীর

জলিলের 'রংপুরী লোকভাষা'। *মোহাম্মদী*, ৩৫ বর্ষ ১ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৭০) প্রভৃতি। চট্টগ্রামের উপভাষা নিয়ে মোস্তফা ইকবালের 'চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা প্রসঙ্গে' (*দৈনিক পয়গাম*, বন্দর নগরী চট্টগ্রাম—বিশেষ সংখ্যা, জানু ১৫, ১৯৬৯), মুহম্মদ আবদুল হাই-এর 'চট্টগ্রামের উপভাষা' (*মাহেনও*) প্রভৃতি।

ঢাকার উপভাষা সম্পর্কে খান আব্দুল ময়ীদের 'ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের কথিত ভাষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ' (উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কার্যবিবরণী, ১৩১৭), আবুল ফজলের 'ঢাকাই প্রশ্ন' (*আবুল ফজল রচনাবলি* ১, ১৩৮২), ড. কাজী দীন মুহম্মদের 'ঢাকার ভাষা' ('ঢাকা' সংখ্যা, *দৈনিক পয়গাম*) প্রভৃতি। ময়মনসিংহের উপভাষা নিয়ে বিমলকান্তি দে-র 'ময়মনসিংহের উপভাষা' (*ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি* ১৯৭৮, গোলাম সমাদানী কোরায়শী সম্পাদিত) ও আবদুর রজ্জাকের 'ময়মনসিংহের উপভাষা' (*বিচিত্রা*, ১৯৭৫) প্রভৃতি। টাঙ্গাইলের উপভাষা নিয়ে আলমগীর জলিলের 'টাঙ্গাইলের উপভাষা' (*ইত্তেফাক*, বৈশাখ ১৯, ১৩৭১) প্রভৃতি। কুমিল্লা ভাষা নিয়ে গৌরচন্দ্র ঘোষের 'ত্রিপুরা জেলার কথ্যভাষা' (১৯১৭), মোহম্মদ আবু তাহেরের 'কুমিল্লার অঞ্চলিক ভাষার রূপরেখা (*পূবালী* ৬ বর্ষ, ৯-১১ সংখ্যা, আষাঢ়-ভদ্র ১৯৭৩) প্রভৃতি। বরিশালের ভাষা নিয়ে সুলতান আহমদ ভুঁইয়ার 'বরিশাল জেলার কথ্য ভাষা' (*আজাদ*, পৌষ ২২, ১৩৬৩, জানু ১৯৫৭) উল্লেখযোগ্য। ফরিদপুরের উপভাষা নিয়ে সুলতান আহম্মদ ভুঁইয়া 'গোয়ালন্দ মহাকুমার বিভাষা' (*আজাদ*, জানু ৬, ১৯৫৭) প্রভৃতি। সিলেটী ভাষা নিয়ে শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর 'সিলেটী ভাষা' (১৯৬১), 'সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত কতকগুলো ধাতু ও ক্রিয়াপদ' (*বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, ত্রয়োবিংশ বর্ষ, শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮৫), আব্দুর রাজ্জাকের 'চট্টগ্রাম ও সিলেটী বাংলা ভাষার রূপ' (*আল ইসলাম* ১৩৪৭), ব্রজদয়াল বিদ্যাবিনোদের 'শ্রীহট্টীয় কথ্যভাষা', সৈয়দ মুজতবা আলীর 'সিলেটা' (*পরিক্রম* ১ম বর্ষ ৬ সংখ্যা মাঘ ১৩৬৯), মুহম্মদ আসান্দর আলীর 'সিলেটের আঞ্চলিক ভাষার বাগধারা' (*কাফেলা* ১৯৭০), নুর-ই-ইসলাম সেলু বাসিতের 'সিলেটের উপভাষা : সাংগঠনিক বিশ্লেষণ' (*বাংলা একাডেমি* ২০০৮) প্রভৃতি। যশোরের ভাষা নিয়ে মুস্তফা মাসুদের 'আঞ্চলিক শব্দ ও ধ্বনিরীতি' (*পূর্বাচল*, ভাদ্র ১৩৮৬), ড. নওশের আলমের 'যশোর অঞ্চলের উপভাষা' (২০১০) প্রভৃতি।

বাংলাদেশের উপভাষাচর্চার তিনটি রূপ অর্থাৎ ঐতিহ্যবাহী বা ধ্রুববাদীগণের আলোচনা, ব্যাকরণিক উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং বর্ণনামূলক আলোচনা ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু আলোচনা পাওয়া যায় এবং এগুলো প্রধানত উপজাতীয় ভাষার বর্ণনামূলক আলোচনা, যেখানে গ্রিয়ার্সনের রীতির ছাপ স্পষ্ট।[২১] যেমন গারো ভাষা নিয়ে আব্দুর রহমান ফিরোজীর 'গরোবুলি' (*বাংলা একাডেমি* পত্রিকার প্রকাশ), চাকমা ভাষা নিয়ে সতীশচন্দ্র ঘোষের পর আব্দুর সাত্তার, প্রভাতকুমার দেওয়ান, ননাধন চাকমা ও সুহৃদ চাকমা এবং মোহাম্মদ আবদুল আওয়ালের আলোচনা পাওয়া যায়। ননাধনের আলোচনায় চাকমাভাষা ও ধ্বনির

ঐতিহাসিক দিকগুলো স্পষ্ট করার চেষ্টা আছে। তবে তাঁর অধিকাংশ সিদ্ধান্ত এখনো বিতর্কিত। তারপরও চাকমা ভাষা বিষয়ক লেখকগণের নিবন্ধসমূহ উল্লেখ করে বলা যায়, বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাকমা উপভাষার আলোচনার সূত্রপাত এখান থেকেই শুরু।

এছাড়া অন্যান্য উপভাষা গবেষকগণের মধ্যে আমরা আরো উল্লেখ করতে পারি ড. কাজী মোতাহার হোসেন, সৈয়দ সাজ্জাত হোসাইন, আবদুল গাফফার চৌধুরী, নেয়ামল বশীর, বসির আল হেলাল, শামসুজ্জামান খান (যিনি বর্তমানের বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক) প্রমুখ।

বাংলাদেশে উপভাষাচর্চার বাস্তব কিছু প্রয়োগক্ষেত্র বা ব্যবহার ক্ষেত্রের কথা আমরা উল্লেখ করতে চাই। বাংলাদেশের সাহিত্যে বিশেষ করে কথাসাহিত্যে উপভাষার প্রয়োগ অনেক গুণ বেড়েছে। আমরা এ প্রসঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র *লালাসালু*, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা*, শওকত আলীর *প্রদোষে প্রাকৃতজন*, অদ্বৈতমল্ল বর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম*, আলাউদ্দিন আল আজাদের *কর্ণফুলী*, হাসান আজিজুল হকের *আগুন পাখি*, সেলিনা হোসের *হাঙর নদী গ্রেনেড* প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে পারি। লেখকগণ তাঁদের উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের কথোপকথনে উপভাষার ব্যবহার দেখিয়েছেন। টেলিভিশনের বিভিন্ন নাটকে, চলচ্চিত্রে উপভাষার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। এছাড়া ঢাকা FM রেডিও চট্টগ্রাম ও সিলেটের ভাষা নিয়ে প্রতিনিয়ত নানা অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রতি শুক্র ও শনিবার দুপুর ২-৩০ টায় এ ধরনের অনুষ্ঠান শুনতে পাওয়া যায়।

বলা যায়, এ সকল বিষয় বাংলাদেশের উপভাষা চর্চায় যেমন গতি এনেছে তেমনি বৈচিত্র্যের অনুষঙ্গও সংযোজিত হয়েছে।

বাংলাদেশে উপভাষাচর্চা : সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়

বিস্তীর্ণ ভূ-অঞ্চল ও জনবাসী এলাকা জুড়ে বাংলা ভাষার প্রজাসমূহ উপভাষাগুলো ছড়িয়ে আছে। এসব উপভাষা নিজ নিজ অঞ্চলে ও অন্যত্র আবহমানকাল ধরে যে ধারা সৃষ্টি করে রেখেছে তা বহুবর্ণা, বহু প্রকৃতির এবং একই সঙ্গে শত উৎসমুখী।[২২] তাছাড়া বাংলাদেশের উপভাষার অঞ্চল ভাগটা অস্পষ্টও বটে। পূর্বে থেকে পশ্চিম বা পশ্চিম থেকে পূর্ব এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ অঞ্চলে মিশ্র সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের কারণে কোনো বিশেষ উপভাষার শেষ সীমা পাওয়া তো দূরে থাক তার সূচনা কোথায় তা বোছা দুষ্কর। অর্থাৎ বোঝা গেল উপভাষার অঞ্চল বিভাজনে সমস্যা প্রকট।

গ্রিয়ার্সনের পর বাংলাদেশে উপভাষা জরিপের উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি বললেই চলে। যদিও বিচ্ছিন্নভাবে কিছু জরিপের কাজ হয়েছে, সেখানেও পরিকল্পনা ও সুসংবদ্ধতার যথেষ্ট অভাব। ঐ সকল বিচ্ছিন্ন জরিপকালে উপভাষা সংগ্রাহক কী উদ্দেশে উপভাষা সংগ্রহ করেছেন সে সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনা ছিল না। সংগ্রাহক উপভাষা সংগ্রহ করেছেন ভাষার বর্ণনার জন্য, নাকি অভিধান সংকলনের জন্য, না উপভাষার মানচিত্র

তৈরির জন্য, তা তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন না। অর্থাৎ অনেকটা উদ্দেশ্যহীনভাবে সংগ্রাহককে পথ হাঁটতে হয়েছে। অন্যদিকে উপভাষা চর্চায় তাত্ত্বিকতা, উপভাষার পঠন-পাঠনে, উপভাষা ব্যবহারের মাত্রাজ্ঞানে এবং শেষপর্যন্ত সংরক্ষণে সমস্যা রয়েছে।[২৩] এ ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু কার্যত সে ভূমিকা নিতান্তই অপ্রতুল। আবার সরকারি অর্থ বরাদ্দের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। সরকার এ খাতে যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দে কার্পণ্য করে থাকে। ফলে আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। পঠন-পাঠন বিষয়ে বলা যায়, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে উপভাষা পঠন-পাঠনের জন্য সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তর বিষয়টি এখনো গুরুত্বহীন এবং কেবলই দায়সারা গোছের। এ কারণে উপভাষা চর্চায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। অন্য যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, উপভাষা চর্চায় কৌশলের অভাব এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে অক্ষমতা। বিদেশে উপভাষাচর্চার ক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে ডেটাবেজের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে উপাত্তের উপাদানগত ব্যাখ্যা চাইলেই কম্পিউটার থেকে সহজেই নির্ভুল ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব-এটা কি মিশ্রণ না স্বেচ্ছাকৃত উপাদান। অন্যদিকে আমরা জানি উপভাষা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেঁচে থাকে প্রাচীন বা প্রৌঢ়জনদের দ্বারা। তরুণদের দ্বারা বলা যায় এগুলো নষ্ট হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উপভাষা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রৌঢ়জনদের প্রাধান্য কম দেওয়ার ফলে সমস্যা বাড়ছে বৈ কমছে না।

ইদানিং বাংলদেশের চট্টগ্রামের তরুণেরা তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই উপভাষাচর্চার সমান্তরালে শিষ্টভাষা বা স্ট্যান্ডর্ড ল্যাঙ্গুয়েজ চর্চা করছে। এর ফলে উপভাষা চর্চায় মিশ্রণজাত সমস্যা তৈরি হচ্ছে। আবার চট্টগ্রাম কিংবা সিলেটের উপভাষা চর্চাকারীদের মধ্যে অভিজাতশ্রেণি যে ভাষার কথা বলছে নিম্নশ্রেণি ঠিক সে ভাষায় কথা বলছে না। ফলে উপভাষা চর্চায় সামাজিক সমস্যাও তৈরি হচ্ছে। এই দুই অঞ্চলের লোকজনেরা কেউ কেউ শিষ্টভাষার কথা বললেও আভিজাত্য কিংবা আত্মাভিমানের জন্য নিজেদের কথার টানটা ছাড়তে পারছে না বা ছাড়তে চাইছে না। ফলস্বরূপ উপভাষা চর্চায় বিশেষ করে রূপমূল নির্ধারণে মিশ্রণজাত ও স্বেচ্ছাকৃত নানা সমস্যার উদ্ভব ঘটছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলা উপভাষা নিয়ে গবেষণার এক বিরাট ক্ষেত্র এখনো পতিত আছে। বস্তুত যাঁদের অবদানে জ্ঞানের এই বিশেষ শাখা সমৃদ্ধ, ক্ষেত্র অনুযায়ী তা যথেষ্ট নয়। তাছাড়া বাংলাদেশের উপভাষা বিশ্লেষণ প্রধানত ভৌগোলিক এবং প্রচলিত ব্যাকরণের পদ্ধতিতে করা হয়েছে। এ কথা বলা যায় না, আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশের উপভাষাসমূহ সনাক্তকরণ বা বিভিন্ন উপভাষার পূর্ণাঙ্গ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হয়েছে এবং হচ্ছে। অপ্রিয় হলেও সত্য, অদ্যাবধি বাংলাদেশে একটি উপভাষা-মানচিত্র প্রণিত হয়নি। ইতোমধ্যে বাইরের পৃথিবীতে উপভাষাতত্ত্ব আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাষাতাত্ত্বিক গণ্ডি অতিক্রম করে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজতাত্ত্বিক

পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তাই বাংলাদেশে উপভাষার বৈচিত্র্য অনুসন্ধান কেবল ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাকরণ ও সাংগঠনিক ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতির পরিবর্তে জেনারেটিভ পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। উপভাষার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ নির্মাণে আমাদের আরো মনোযোগ দেওয়া দরকার।[২৪] তবে আশার কথা হল এই, সুবাতাস বইছে। বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের উপভাষাকে ভাষাবিজ্ঞানের ব্যাপক শৃঙ্খলার সঙ্গে সংযুক্ত করতে প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং আমরা আশা করছি খুব শীঘ্রই এ প্রকল্পের চূড়ান্ত রূপ আলোর মুখ দেখবে। বাংলদেশে উপভাষাচর্চা পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেকগুণ বেড়েছে এটিও আশার কথা। তবে এক্ষেত্রে কতটুকু যত্ন নিয়ে উপভাষাচর্চা হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা দরকার। তাছাড়া উপভাষাকে জনপ্রিয় করে তুলতে একে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি আমাদেরকেই করতে হবে।

শেষকথা

আধুনিককালে ভাষার চেয়ে উপভাষা নিয়েই বিস্তৃত গবেষণা করছেন ভাষাবিজ্ঞানীরা। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে, বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে এর গুরত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশেও এর চর্চা থেমে নেই। তবে সরকারি পৃষ্টপোষকতা এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য যৌক্তিক অর্থ বরাদ্দ পেলে, উপভাষা চর্চা বহুগুণে বেড়ে যেত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। উপভাষা চর্চায় এদেশের তরুণ ভাষা গবেষকদেরকে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে এবং প্রায়োগিত ক্ষেত্রে (Applied field) উপভাষা চর্চার বিভিন্ন দিক কাজে লাগাতে হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. হুমায়ুন আজাদ সম্পা. (২০১১), *বাঙলা ভাষা* (প্রথম খণ্ড-অবতরণিকা), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

২. সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৭), *আধুনিক বাংলা ভাষাতত্ত্ব*, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ.১৭

৩. সুভাষ ভট্টাচার্য (২০১০), *ভাষার অভিমুখ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২৫

৪. সুখেন বিশ্বাস (২০১৪), *প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা* (দ্বিতীয় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ.২৪

৫. পূর্বেক্ত, পৃ.২৫

৬. পূর্বোক্ত

৭. সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৭) *আধুনিক বাংলা ভাষাতত্ত্ব*, প্যাপিরাস, কলকাতা পৃ.১৮

৮. রামেশ্বর' শ (২০০৯), *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ.৬৪৬

৯. সুভাষ ভট্টাচার্য (২০০০), *বাঙালির ভাষা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা. পৃ ৬৫
১০. মনিরুজ্জামান(১৯৯৪), *উপভাষা চর্চার ভূমিকা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ.৫৪
১১. সুভাষ ভট্টাচার্য (২০১০), *ভাষার অভিমুখ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ.২৬
১২. হুমায়ুন আজাদ সম্পা, (২০১১), *বাঙলা ভাষা* (প্রথম খণ্ড), আগামী প্রকাশনী ঢাকা, পৃ.৯২
১৩. সুভাষ ভট্টাচার্য (২০১৪), *ভাষাকোষ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ.৭৩
১৪. সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৭), *আধুনিক বাংলা ভাষাতত্ত্ব*, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ.২২
১৫. রামেশ্বর' শ (২০০৯), *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ ৪৪৯
১৬. লিপিকা সাহা (২০১৪), *ভাষানীতি ভাষাপরিকল্পনা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ.১১
১৭. অভিজিৎ মজুমদার (২০১৪), *ভাষাপ্রসঙ্গ ও ধ্বনিবিজ্ঞান*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প. ১৮
১৮. পলাশ বরণ পাল (২০১১), *আ মরি বাংলা ভাষা*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, পৃ.১১
১৯. অনিমেষকান্তি পাল (২০০৯), *বাংলা ভাষা : পূর্ব-পশ্চিম*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, পৃ.২৫
২০. মনিরুজ্জামান (১৯৯৪), *উপভাষা চর্চার ভূমিকা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ.৫৬
২১. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৩
২২. রামাপ্রসাদ দাস (২০০০), ভাষার বুনিয়াদ : কিছু প্রসঙ্গ, *পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি*, কলকাতা, পৃ. ২০
২৩. প্রবাল দাশগুপ্ত (২০১২), *ভাষার বিন্দুবিসর্গ*, গাঙচিল, কলকাতা, পৃ.১৯৬
২৪. সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৭), *আধুনিক বাংলা ভাষাতত্ত্ব*, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ.১৯।